মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য: ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন (১৭০০-১৮৯৯)

পিএইচ.ডি (কলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

পাভেল সুলতানা

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং- A00BE1401517

তত্ত্বাবধায়ক

ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী

প্রাক্তন অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৩

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য: ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন (১৭০০-১৮৯৯)

পাভেল সুলতানা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা:

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত যে সাহিত্য তা মূলত 'বটতলার সাহিত্য', 'দোভাষী সাহিত্য', 'মুসলমানী বাংলা কাব্য' এবং 'পুথি সাহিত্য' ইত্যাদি নামে পরিচিত। মুসলমান সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যের ধারায় নিজেদের মতো করে সাহিত্য রচনার পথ তৈরি করে নেয়। সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের জনজীবন, নিজেদের কালচারের কথা যেমন বলেছেন পাশাপাশি বাঙালি জাতির নিজস্ব যে একধরনের কালচার তার কথাও বলেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকরা আরব, পারস্য দেশের কাহিনির দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়ে কলম ধরেছেন অন্যদিকে হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাবেও সাহিত্য রচনা করেছেন। আরাকান রাজদরবারের রাজসভার সাহিত্য যেমন আমরা পাই তেমনভাবেই লৌকিক সাহিত্যের সম্ভার নিয়েও হাজির হয়েছেন মুসলমান সাহিত্যিকরা।

আরাকান, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ইত্যাদি অঞ্চলের কথা অনায়াসেই এসে পড়ে মুসলমান সাহিত্যিকদের কথা প্রসঙ্গে। এই অঞ্চলগুলি সাহিত্য রচনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বঙ্গদেশের সঙ্গে আরাকান-চট্টগ্রাম এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহু আগে থেকেই তৈরি হয় ইতিহাসের হাত ধরে। মুসলমান সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষাকে রাজদরবারে স্থান দিয়ে নতুনভাবে সাহিত্য সৃষ্টির পথ খোঁজেন। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান থেকে শুরু করে লোকজীবনের সাহিত্যের ধারা তাঁদের হাতেই তৈরি হয়। লৌকিক দেবতা-পীরদের নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে থাকে। মধ্যযুগের ইসলামি

সাহিত্য যে শুধুমাত্র রোমান্টিকতার জায়গায় থেমে থাকেনি, বিভিন্ন ধরনের রচনার কলাকুশলীতে মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন একথা বলা যেতেই পারে। বাংলা সাহিত্যের যে ধারা তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামি সাহিত্যের স্পর্শ আছে। অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য সবর্ত্রই এর অবাধ বিচরণ লক্ষ করার মতো। এইভাবে বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে ইসলামি সাহিত্য তার গতিপথে এগিয়ে গেছে।

সংস্কৃতির আলোচনায় বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতির কথা উঠে আসে। বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক ধারায় বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষাগত বিভেদ থাকলেও সাংস্কৃতিক রুচি সম্পর্কিত বিষয়ে সমমনোভাবাপন্ন ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই মুসলমানদের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৈরি হতে শুরু করে। ফলে সমাজজীবন ও সংস্কৃতিতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ্যতার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষে মুসলিম কালচার বা সংস্কৃতি বলতে তাই একদিকে যেমন আরবি-ফারসি সংস্কৃতির কথা এসে পড়ে অন্যদিকে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের রূপও ধরা দেয়। একইসঙ্গে সুফি অনুশীলনের দিকগুলিও বেশ স্পষ্ট হয়। সুফি দর্শন, চিন্তা এবং তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ মধ্যযুগের ভারতীয় জনজীবন, সমাজ এবং সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমান জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে সুফি মতবাদ জড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে বিরাট পরিসরে সমন্বয়-সাধিত হয়েছিল বলে যে ধারণায় আমরা প্রলুব্ধ সেই সাংস্কৃতিক দিকের বহুমাত্রিকতাকে জেনে নেওয়া আমাদের দরকার। বর্তমান গবেষণার ভিতর দিয়ে আমরা সেই সংস্কৃতির নানা দিককে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছি। আসলে আমাদের গবেষণার মূল জায়গা হল একদম সাধারণ জনজীবনকে ধরে প্রচলিত কালচার বা সংস্কৃতি যেমন- ঘর, বাড়ি, বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, বসন এই বিষয়গুলিকে একেবারে অবজেকটিভ (Objective) জায়গা থেকে দেখা বা প্রেজেন্ট (Present) করা। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে আসলে

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি এবং ভাষা এই দুটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা

এই অধ্যায়ে মধ্যযুগের সময়পর্বে মুসলমান সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে পারছি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই মূলত এই সাহিত্যিকদের লেখা আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পেয়ে থাকি। তারপর সময়ের হাত ধরে ইসলামি সাহিত্যের গতি বেড়েছে এসেছে নতুন নতুন কাব্য, যা পাঠকদের নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে। এছাড়া এই সাহিত্যের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা জানতে পারি, যে বৈশিষ্ট্যগুলি এই সাহিত্যকে সমসাময়িক ঘরানার সাহিত্য থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছে। মুসলমান সাহিত্যিকরা আরব-পারস্যের সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যেমন সাহিত্য রচনা করেছেন একথা যেমন সত্য পাশাপাশি দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাবে হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনা-পদ্ধতিকেও গ্রহণ করেছেন। সাহিত্য রচনায় আলাদা ধরনের ঘরানা তৈরির মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবন, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। গোটা বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলিম উভয়ের নিজস্ব একধরনের যে সংস্কৃতি তা মুসলমান সাহিত্যকরা বহন করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: বিভিন্ন সংরূপ ও শ্রেণিবিচারের পর্যালোচনা

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বিভিন্ন ধারার সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা আমরা এই অধ্যায়ে পেয়ে থাকি। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধারা যেমন- জঙ্গনামা, নীতিশাস্ত্রমূলক রচনা, ধর্মীয় ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক রচনা, পীর সাহিত্য, কেচ্ছা কাহিনি ইত্যাদি বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। রোমান্টিক

প্রণয়োপাখ্যানের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের যে প্রেমের আখ্যান নির্মাণ করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বকে তুলে ধরে। নিজেদের ধর্ম-ইতিহাস, নবিদের জীবনকে কেন্দ্র করেও সাহিত্য রচিত হয়েছে, এই রচনার মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রাণপুরুষ প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ এর জীবন, আদর্শ এবং তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের যে মর্মবাণী আমরা তার কথা জানতে পেরেছি। ইমাম হাসান ও হোসেনের জীবনের ঘটনা সমগ্র মুসলিম জগতে স্মরণীয়। মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের লেখনীতে এই করুণ কাহিনিকে তুলে এনেছেন। বিভিন্ন সাহিত্যিকরা জঙ্গনামা নাম দিয়ে এই পুরো বিষয়বস্তুকে কাব্যের আকারে জনমানসে এঁকেছেন। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান জনমানসে পীর বা ফকিরেদের মধ্য দিয়ে এক সমন্বয়ধর্মিতার সূত্র তৈরি হয়। উভয়সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই পীরের পূজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এক মিলনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই ভাবনা থেকেই হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকরা একের পর এক সাহিত্য রচনা করেছেন। এছাড়া বেশকিছু মুসলমান সাহিত্যিক ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতি বিষয়ক সাহিত্যও রচনা করেছেন যা নীতিশিক্ষামূলক সাহিত্যের আওতাভুক্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য জগতে ইংরেজি ‘মিস্ট্রি’ রচনার মতো একধরনের রচনার কথা প্রকাশ পেতে থাকে যা ‘গুপ্তকথা’ নামে চিহ্নিত হয়েছে, এক্ষেত্রে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ (১৮৯৮) এই উপন্যাসটি স্মরণে আসে। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকর্ম মূলত বটতলার প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। মুসলমান সাহিত্যিকরা এই গুপ্তকথাকেও খানিক নিজেদের মতো করে বলার চেষ্টা করেছেন। তবে আমাদের মনে রাখার মতো মুসলমান সাহিত্যিকরা এই রচনাকে ‘কেচ্ছা বা কিসসা’ নামে অভিহিত করেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকরা কেচ্ছা রচনার ক্ষেত্রেও আরব-পারস্যের গল্পকথাকে আঁকড়ে ধরেছেন। তবে গুপ্তকথার অনেক আগেই মুসলমানী কেচ্ছা আমরা ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্যে পেতে থাকি। এক্ষেত্রে বলা যায় একধরনের স্বকীয়তা মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের সাহিত্য রচনায় এনেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: নিবিড়পাঠ ও বিশ্লেষণ (নির্বাচিত সাহিত্য)

এই অধ্যায়ে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত সাহিত্যগুলির নিবিড়পাঠ করে বিশ্লেষণ যেমন করেছি পাশাপাশি কাব্য রচনার উৎস, সমসাময়িক সময়ের সাহিত্যের সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্য রেখে সাহিত্য রচিত হয়েছে সেই সব বিষয় এই অধ্যায়ের আলোচনায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। গল্পের যে প্লট নির্মাণ হয়েছে তাতে অন্য লেখকের প্রভাব থাকলেও মুসলমান কবিরা আপন স্বকীয়তায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। একই বিষয়কে প্লট করে কাব্য রচিত হলেও সময়ের বদলে লেখার ধরনও বদলে গেছে। শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য যেভাবে বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী শতকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে গরীবুল্লাহ একই বিষয় নিয়ে যখন কাব্য রচনা করেন সেক্ষেত্রে লেখার প্যার্টান অনেকটাই পালটে গেছে। অনেক সময় উর্দু গ্রন্থ থেকে কাব্য অনুবাদ করেছেন মুসলমান সাহিত্যিকরা। শ্রীমনিরদ্দিন আহাম্মদ 'কালন্নবি' কাব্যটি উর্দু গ্রন্থ থেকে অনূদিত হয়েছে। বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বাঁধন আরও পরিস্ফুট হয়েছে সাহিত্যিকদের হাতে। হিন্দু দেবতা সত্যনারায়ণ মুসলমান সমাজে সত্যপীরের রূপ নেয়। কিন্তু এই পীরের ভক্তিতে মাথা নত করেছেন উভয়সম্প্রদায়ের মানুষ। মুসলমান সাহিত্যিকরা এই সত্যপীরকে নিয়ে কাব্য রচনার ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজের কথা তুলে ধরেছেন এবং সাংস্কৃতিকভাবে তাঁদের মিলনকে চিত্রিত করেছেন। অপরদিকে হিন্দু সাহিত্যিকরাও সত্যনারায়ণকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন যে কাব্যের মধ্যেও উভয়সম্প্রদায়ের কথা এসেছে। সত্যপীর ছাড়াও গাজি পীর, কালু পীরের কাহিনি নিয়ে কাব্য লিখেছেন মুসলমান সাহিত্যিকরা। সবসময় যে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মিলনের চিত্র ফুটে উঠেছে এমন নয়। ক্ষমতার শীর্ষে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে দুই পক্ষই কখনও কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। গাজি পীরের সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ, পরবর্তীতে পীরের কাছে বশ্যতা স্বীকার মধ্য দিয়ে সখ্যতা গড়ে ওঠা এই চিত্রও আমাদের সামনে আসে। আমরা 'গাজি কালু ও চাম্পাবতী

কন্যার পুথী' এই কাব্যে হিন্দু-মুসলমানের মিত্রতার চিত্র দেখি। গাজি পীর ও চাম্পার প্রেমের সার্থকতা ধর্মীয় বিভেদ ভুলিয়ে দেয়। আমরা কেচ্ছা বা কিসসা সাহিত্যে দেখি মুসলমান সাহিত্যকরা আরব-পারস্যের কাহিনিকে নিয়ে যেমন কাব্য রচনা করেছেন অন্যদিকে দেশীয় কাহিনির প্রভাবও পড়েছে। পীরদের কাহিনি নিয়েও কেচ্ছা রচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: দৈনন্দিন জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির নানাদিক (নির্বাচিত সাহিত্য)

এই অধ্যায়ে নির্বাচিত সাহিত্যগুলির মধ্যে সংস্কৃতির যে বহুদিকের কথা তুলে ধরা হয়েছে তার প্রতি অবলোকন করাই উদ্দেশ্য। এই সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে সর্বধর্মের সংস্কৃতিকে খুঁজে তুলে ধরাই কাজ এবং কোনটি কোন সংস্কৃতির কথা বলে তার উল্লেখ করা। মূলত মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যে আমরা 'ইসলামি সংস্কৃতি'কেই খুঁজে পেতে থাকি কিন্তু পাশাপাশি আমাদের এই সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে সাধারণ জনজীবনের যে সংস্কৃতি যেমন- ঘর, বাড়ি, খাদ্য, বসন, প্রসাধন এগুলোর পরিচয় পেতে চেয়েছি। একদম সাধারণ জনজীবনের সংস্কৃতির দিকগুলিকে আমরা চিনে নিতে চেষ্টা করেছি সেই সঙ্গে মুসলমান সমাজের যে সংস্কৃতি তার কথাও এসেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে। সংস্কৃতির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে ছবি তা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। পতিসেবা, নারীর গর্ভধারণ, নারীর ঋতুস্রাব, সতিন প্রসঙ্গ, নারীর সাজসজ্জা, পুরুষের পেশা, বিনোদন ইত্যাদি এইরকম বহু চিত্র সংস্কৃতিকেই বহন করে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা আসলে একটা জাতির সংস্কৃতিকে যেমন বুঝে নিতে চেয়েছি অপরপক্ষে একদম সাধারণ মানুষের জনজীবনের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবিও ফুটে ওঠে। আসলে সংস্কৃতির আলোচনার মধ্য দিয়ে গোটা বঙ্গদেশের সমাজজীবনে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দিকগুলিকেও চিনে নিতে চেয়েছি। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকর্মে শুধুমাত্র নিজেদের ধর্মীয় জীবনের কথা এসেছে এমন নয় সামাজিক পরিমণ্ডলে একই সূত্রে

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে অন্যান্য সংস্কৃতির প্রসঙ্গকেও নিজেদের কাব্যে স্থান দিয়েছেন। মুসলমান সংস্কৃতি কি আলাদা করে নিজেদের জায়গা তৈরি করতে পেরেছে? এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি দেয়। কিন্তু গবেষণার আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই বার্তা যেমন এসেছে তার চেয়েও সামাজিকভাবে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে পারস্পরিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কতটা আলিঙ্গনে বদ্ধ তাও পরিস্ফুট করেছে। তাই মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের মধ্যে শুধুমাত্র একক সংস্কৃতির কথা উঠে আসে না বরং সমন্বয়ের বার্তা বহন করে এই সংস্কৃতির আলোচনা।

পঞ্চম অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: সুফি সাধনার প্রভাব

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় সুফিদের কথা খুব স্বাভাবিক প্রয়াসেই চলে আসে। সুফিবাদ সম্পর্কে অনেক মত প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে সুফিদের আগমন কবে? কীভাবে সুফিরা বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে একাত্মতা তৈরি করে নেয়। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় সুফি মতবাদ কতটা এসেছে? এবং হিন্দু বৌদ্ধ তন্ত্রের মতবাদের সঙ্গে সুফিবাদ কোথায় মিলে যাচ্ছে তার আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন যেমন নতুন সংস্কৃতির ধারাকে বয়ে আনে এর সঙ্গে সুফি সংস্কৃতিও ভারতবর্ষ তথা বাংলার মাটিতে নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয়। সুফিরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পর ইসলামীয় জীবন দর্শনে যেমন জড়িয়ে গেছে পাশাপাশি হিন্দু জনমানসেও সুফি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুফিভাবনার মধ্য দিয়েও হিন্দু-মুসলিম উভয়সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিকগত দিক দিয়ে মিলনের পথ তৈরি হয়ে যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য

এই অধ্যায়ে ভাষাগত বিশ্লেষণের দিকটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যে ‘দোভাষী ভাষা’ কতটা প্রয়োগ করা হয়েছে তার তালিকা করে শব্দ ব্যবহারের প্রায়োগিক দিকগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া সমাজভেদে

ভাষার পার্থক্য নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কাব্যে বানান রীতি ও তার প্রয়োগের দিকটিও এখানে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বানান ব্যবহারে যে বৈষম্য লক্ষিত হয়েছে তার যথাযথ কারণ উপস্থাপন করা এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনায় ভাষাগত সমস্যা কেন দেখা দিয়েছিল? সেই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা জেনেছি। মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের রচিত সাহিত্যে 'দোভাষী ভাষা' প্রয়োগ করে। ভাষাগত নানারকম স্বাতন্ত্র্যের কথা মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় আমরা পেয়ে থাকি। সামাজিকভাবে মুসলমানরা তাঁদের লেখায় ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত থেকেছেন একই সঙ্গে স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনধারায় আরবি-ফারসির প্রভাবে আত্মীয়তা বা সম্বোধনের ভাষাতেও আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি প্রভৃতি ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। মূলত কেচ্ছা সাহিত্যে সাধারণ জনজীবনে নারীর একধরনের মুখের ভাষা আমরা পেয়ে থাকি, নারীর পতিনিন্দা, নারীর বেদনা, নারীর দুঃখপ্রকাশ, স্বামীর জন্য আর্তনাদ, পুত্রশোক ইত্যাদিতে একদম নিজেদের মতো করে সাবলীর ভাষার প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের রচিত সাহিত্যে শব্দ ব্যবহারে বানানের যে রীতি'র প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তার মধ্য দিয়েও তাঁদের নিজস্ব একধরনের লেখার স্টাইল বজায় রেখেছেন।

উপসংহার

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যে আমরা যে সংস্কৃতির পরিচয় পাই সেই সূত্র ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারাকে সম্পৃক্ত করে 'সংস্কৃতি' বিষয়ক ধারণাকে সাজানোর একটি পরিসর তৈরি করা হয়েছে এই অংশে। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে কীভাবে এই মুসলমানী ধারা মিশে যাচ্ছে তার কথা তুলে ধরা হয়েছে এখানে। পাশাপাশি আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি ইত্যাদি ভাষার যে ব্যবহার কাব্যগুলিতে পরিলক্ষিত হয় সেই ভাষাগুলির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজ-ভাষার যে নির্মাণ সেই দিকটিকেও বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলমানরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পর নিজেদের সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে হিন্দুদের

সঙ্গে সখ্যতাও গড়ে তোলে। কখনও সামজিকক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভূ ক্ষমতার চেষ্টায় লড়াই এ সামিল হলেও শেষপর্যন্ত মিলনের পরিসর তৈরি করেছে।

আসলে আমরা এই গবেষণার ভিতর দিয়ে বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চিত্রকে যেমন তুলে এনেছি সেই সঙ্গে মিশ্র-সংস্কৃতির যে বহমানতা তাকেও বুঝে নিয়েছি। ভারতবর্ষে অন্যান্য জাতির মতোই মুসলমানরাও এদেশের সংস্কৃতিতে মিশে গেছেন একথা যেমন সত্য অপরদিকে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাকেও বয়ে নিয়ে চলেছেন। আসলে ভারতবর্ষে বসবাসকারী মুসলমান এদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা ধীরে ধীরে তৈরি করেছেন। এই গবেষণার ভিতর দিয়ে সংস্কৃতির নানা দিকের কথা যেমন পাচ্ছি আবার সংস্কৃতির বিবর্তন এর দিকটিও আমাদের সামনে উঠে আসে। ধ্রুপদি সংস্কৃতির ধারায় সাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণের দিকটি যেমন আমরা করেছি ঠিক সেইভাবেই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভিতর দিয়েও আর একটি সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যে সংস্কৃতি আসলে মাটির কাছাকাছি মানুষের লোককেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে মূলত সর্বদাই লৌকিক কাহিনিই কাব্যের উপজীব্য হয়েছে। ফলে সমাজজীবনে লৌকিক সংস্কৃতির দিকগুলি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।